প দ্ম জো

ইলমা বেহরোজ

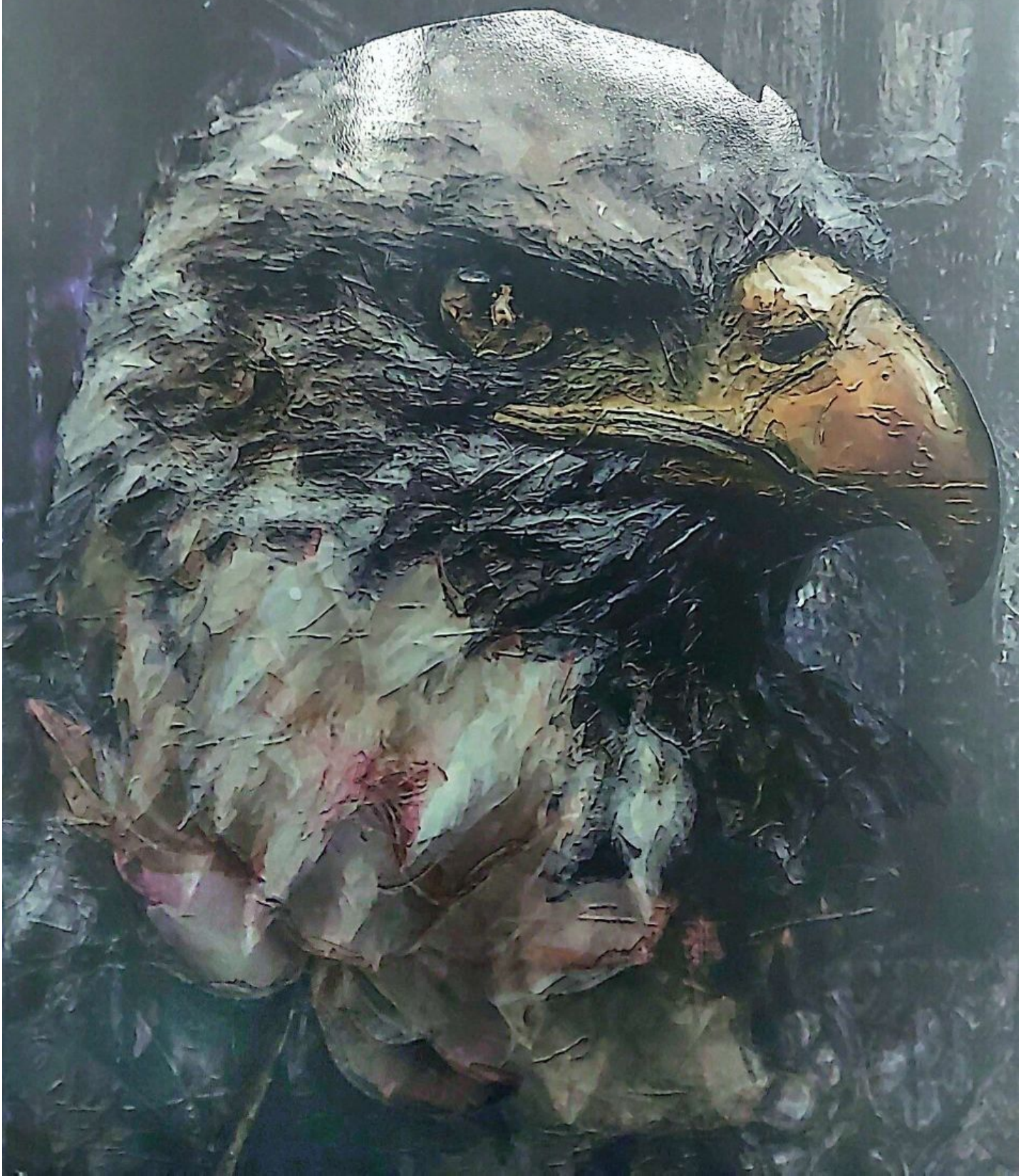

সেদিন শরৎ হেমন্তের সন্ধিক্ষণে নির্জন নিশীথে বয়ে যাওয়া হিমেল হাওয়ায় বিলের পদ্মের সঙ্গে ঘটে চন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ। হঠাৎ স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত হয় কারো আবছায়া। কখনো তা বিশদ আভায় মোহময় করে তোলে চারপাশ–কখনো ঘোর অমাবস্যায় ছেয়ে যায় সমস্ত আকাশ!

আলোছায়ার ঘোলাটে জাহানে বসবাস করা কৃষ্ণবর্ণের ঐন্দ্রজালিক চন্দ্রের জীবনে নির্মল, সুরূপা পদ্মের আকস্মিক পদার্পণ কী পারবে অমানিশার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের অবশিষ্ট কলঙ্কও মুছে দিতে? নাকি অনুরাগের বাঁধনে শুকতারা হয়ে কলঙ্কিত চন্দ্রের কাছাকাছি থেকে যাবে আজন্ম!

– কুহু চৌধুরী

প্রচ্ছদ : ফাইজা ইসলাম

উ ৎ স র্গ

শান্ত, মেধাবী, লাজুক মেয়েটির বিয়ে হয় রাগী, নিরক্ষর একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সঙ্গে। অনেক পড়াশোনার স্বপ্ন ছিল তার। কিন্তু পরিবারে সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় মধ্যবিত্ত বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন কন্যার বিয়ে দেয়ার।

মেয়েটি বই, খাতা তুলে রেখে আঁচলে বেঁধে নেয় সংসারের দায়িত্ব। বাড়ির বড় বউ হওয়াতে শুরু থেকে সবাই অপেক্ষায় ছিল সন্তানের। বছর পেরোয়, কোনো সুখবর আসে না! এক...দুই...তিন করে ছয়টি বছর পার হয় তাও সন্তানের মুখ কেউ দেখে না।

সমাজ ও পরিবারের নানারকম নিন্দে কথায় মেয়েটির বুকের যন্ত্রণা, দহনের মাত্রা দিনকে দিন বাড়তে থাকে। কুসংস্কারে পূর্ণ সমাজ ও পরিবার থেকে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে প্রতিধ্বনিত হতো, আঁটকুড়ী...আঁটকুড়ী... আঁটকুড়ী–বাচ্চা যেহেতু নেই সেহেতু তার বেঁচে থাকার কোনো কারণও নেই।

মেয়েটির স্বামীর পুনরায় বিবাহ হবে, হবে; ঠিক তখনই মেয়েটিকে একঘরে থেকে বাঁচাতে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো ছুটে আসে একটি ভ্রূণ!

এক শ্রাবণের গোধূলি লগ্নে জন্ম হয় ফুটফুটে কন্যা সন্তানের।

মেয়েটির জীবন পূর্ণ হয় ওঠে।

সেই মেয়েটি এখন মধ্যবয়স্ক, সংসারের মহারানি। স্বামী, এক মেয়ে ও দুটি পুত্র নিয়ে তার রাজত্ব।

সেই মহারানি...আমার যোদ্ধা মায়ের জন্য এই উৎসর্গপত্র।

ভূমিকা

ছোটো থেকে সবসময় চাইতাম, সবাই আমাকে ভালোবাসুক, কেউ অপছন্দ না করুক; অনেক অনেক মানুষ আমাকে ভালোবাসুক। কিন্তু জানতাম না, কীভাবে ভালোবাসা পেতে হয়!

তখন সবেমাত্র এসএসসি দিয়েছি।

স্কুলের একটা ছোট ঘটনাকে ঘিরে মানসিক ট্রমায় ছিলাম। তখন হঠাৎ জানতে পারি সোশ্যাল মিডিয়ায় গল্প-উপন্যাস লেখা যায়। ফেসবুকে লেখা যায় শুনে অতিরিক্ত ভাবনা থেকে বাঁচার জন্য সময় কাটাতে একটা ছোট গল্প লিখি। সেখানে পরিচিত কয়জন ভালো মন্তব্য করে, উৎসাহিত করে। অনুপ্রাণিত হয়ে একটা ত্রিশ পর্বের থ্রিলার গল্প লিখি। গল্পটি লিখতে গিয়ে মানসিক চাপ থেকে মুক্ত হই। চরিত্রদের নিয়ে ভেবেই কূল পাই না, আবার অন্যকিছু ভাবব কখন?

তখন ফেসবুকে রোমান্টিক গল্প লেখার ট্রেন্ড ছিল। আমিও ট্রেন্ডে ভেসে দুটি রোমান্টিক গল্প লিখি।

লিখতে গিয়ে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করি।

ভাবি, আর ট্রেন্ড নয়! এইবার নিজের মতো লিখব। সেই ভাবনা থেকেই সৃষ্ট 'পদ্মজা।'

পদ্মজা লিখতে গিয়ে প্রচুর সাড়া পেতে থাকি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় নতুন পর্ব পোস্ট করতেই পাঠকদের হই-হুল্লোর লেগে যেত। আমার প্রাইভেট গ্রুপে (Elma's manuscript's) প্রতিদিন চলত পাঠকদের আগাম ধারণার পোস্ট।

তারপর কী হবে? সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে হতো প্রচুর আলোচনা। একদিন পর্ব না দিলে কমেন্টবক্স, ইনবক্স, গ্রুপ ভেসে যেত পাঠকদের অনুরোধ এবং হুমকিতে।

তখন আমি ছিলাম ষোড়শী কিশোরী, কলেজে ভর্তি হয়েছি কিন্তু করোনা থাকায় কলেজে যেতে হতো না। তাই সারাক্ষণ পদ্মজা ও পাঠকদের নিয়ে মেতে থাকতাম।

আমার কাছে সোনালি দিন মানে পদ্মজা লেখার মুহূর্তগুলো। আমি বারবার বহুবার সেই দিনগুলোতে ফিরে যেতে চাইব।

পদ্মজায় আমি কী লিখেছি, কতটা ভালো অথবা খারাপ লিখেছি তা জানি না। শুধু জানি, এই উপন্যাস আমাকে বিশাল পাঠকসমাজ উপহার দিয়েছে। আমার ছোটোবেলার সেই কাঙ্ক্ষিত 'অনেক মানুষের ভালোবাসা' অর্জন করতে সাহায্য করেছে। যখন বাস্তব জীবনের বেড়াজালে পড়ে শ্বাস নিতে কষ্ট হয় আমি এই পাঠক সমাবেশে নিঃশ্বাস নিতে আসি।

আমি ব্যাকরণ জানি না,
আমি সাহিত্যের সব গণ্ডি চিনি না,
বুঝি না কীভাবে টিকে থাকতে হয়,

শুধু উপলব্ধি করি, মাঝেমধ্যে আমার মাথার ভেতর অনেক চরিত্র, কাহিনি কিলবিল করে। সেই অসহ্যরকম যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে আমি তাদের নিয়ে লিখতে শুরু করি। মন যেভাবে চায় সেভাবে লিখি। কোনো নিয়ম মানি না।

নিয়ম-নীতিবিহীন একটি লেখাকে বইরূপে পাবার জন্য পাঠকদের প্রতিদিনকার আবদার আমাকে প্রতিনিয়ত বিস্মিত করেছে। পদ্মজা লেখার সময় ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি, কখনো পদ্মজা বই হবে। এরকম একটা ভাবনা অসম্ভবের মতো ছিল। আজ পদ্মজার বইরূপে আসার একমাত্র কারণ পাঠকরা। পদ্মজা উপন্যাসের জন্ম আমার জন্য হলেও পদ্মজা বইয়ের জন্ম পাঠকদের জন্য। তাদের আবদারে, তাদের অনুরোধে পদ্মজা বইয়ে পরিণত হয়েছে।

যারা বইটি সংগ্রহ করবে বেশির ভাগই এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় উপন্যাসটি পড়ে ফেলেছে। শুধু ভালোলাগা থেকে বইটি সংগ্রহ করতে আগ্রহী! তাদের প্রতি আমার এক আকাশ ভালোবাসা এবং ভালোবাসা দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা।

ইলমা বেহরোজ
উপশহর, সিলেট

দরদর করে ঘামছে ফাহিমা। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ার উপক্রম। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম হাতের তালু দিয়ে মুছে শীর্ণ পায়ে হেঁটে একটা চেয়ার টেনে বসতেই তার হাত থেকে লাঠি পড়ে মেঝেতে মৃদু শব্দ তুলল। লাঠি তোলার আগ্রহ কিংবা শক্তি কোনোটাই পেল না সে, চেয়ারে ভার ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজল।

ফাহিমার অত্যন্ত দক্ষ হাত, শক্তিশালী বাহু। পুরুষের মতো উচ্চতা তার। জিজ্ঞাসাবাদের দায়িত্ব পালনে সে শতভাগ সফল। আসামির মুখ থেকে কথা বের করতে যেকোনো কিছু করতে বদ্ধপরিকর সে। বড় বড় রাঘব বোয়ালরাও তার সামনে টিকতে পারে না। অপরাধীরা তার হাত থেকে বাঁচার জন্য ভেতরের সব কথা উগড়ে দেয়নি এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। অথচ আজ পাঁচদিন দিন যাবৎ এক অল্প বয়সী মেয়ে তার হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে টু শব্দটিও করেনি। শারীরিক, মানসিক–কোনো নির্যাতন বাকি রাখা হয়নি তবুও তার আর্তনাদ কেউ শুনতে পায়নি! যেন একটা পাথরকে লাগাতার পেটানো হচ্ছে, যার জীবন নেই, ব্যথা নেই; একটি জড়বস্তু মাত্র! এই পাথরের রক্ত ঝরে, কিন্তু জবান খোলে না।

ফাহিমা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চাপা আক্রোশ নিয়ে মেয়েটিকে শাসাল, 'শেষবারের মতো বলছি, মুখ খোল।'

মেয়েটি তার থেকে দুই হাত দূরে চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় ঝিমুচ্ছে। এক মিনিট... দুই মিনিট করে দশ মিনিট পার হয়ে গেল কিন্তু মেয়েটির থেকে কোনো জবাব এলো না। ফাহিমা হতাশাবোধ করছে। চারপাশে থমথমে নীরবতা, মেয়েটি কি নিঃশ্বাসও নেয় না?

নীরবতা ভেঙে যায় বুটের ঠকঠক শব্দে। উপস্থিত হয় ইন্সপেক্টর তুষার। তাকে দেখেই ফাহিমা উঠে দাঁড়ায়, স্যালুট করে।

তুষার পেশাদারী কণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'কী অবস্থা?'

ফাহিমা নিজের ব্যর্থতা প্রকাশ করার সঙ্গে চারদিনের বর্ণনা দেয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। তুষার বহুদর্শী চোখে মেয়েটিকে দেখল তার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে ফাহিমাকে বলল, 'আপনি আসুন।'

রিমান্ডে আসামিকে বিভিন্ন নির্যাতনের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপারটা ফাহিমার কাছে ভীষণ উপভোগ্য। কিন্তু এই প্রথম সে কোনো দায়িত্ব থেকে পালাতে চাচ্ছে। ফাহিমা হাঁফ ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

তুষার একটি চেয়ার টেনে মেয়েটির সম্মুখ বরাবর বসে। ঠান্ডা গলায় বলে, 'আজই আমাদের প্রথম দেখা।'

সামনের মানুষটা যেভাবে ছিল সেভাবেই রইল। কিছু বলল না, তাকালও না।

তুষার বলল, 'মা-বাবাকে মনে পড়ে?'

মা-বাবা শব্দ দুটি যেন নিস্তব্ধ তীড়ে সমুদ্রের ঢেউ নিয়ে আসে। মেয়েটি নড়ে উঠে, চোখ তুলে তাকায়। তার অপূর্ব গায়ের রং, ঘোলাটে চোখ। কাটা ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে। চোখের চারপাশে গাঢ় কালো দাগ। এ নতুন নয়, মুখের এমন দশা রিমান্ডে আসা সব আসামিরই হয়।

তুষার মুখের প্রকাশভঙ্গী আগের অবস্থানে রেখে পুনরায় প্রশ্ন করল, 'মা-বাবাকে মনে পড়ে?'

মেয়েটি বাধ্যের মতো মাথা নাড়ায়। মনে পড়ে। তুষার কিছুটা ঝুঁকে এলো।

মেয়েটির দৃষ্টিজুড়ে নীলচে যন্ত্রণা। তুষার তার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুঁড়ল, 'নাম কী?'

মেয়েটির নাম সহ খুঁটিনাটি সবই জানে তুষার, তবুও জিজ্ঞাসা করল। তার মনে হচ্ছে, অপর পক্ষ থেকে উত্তর আসবে।

তার ধারণাকে সত্য প্রমাণ করতে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে মেয়েটি নিজের নাম উচ্চারণ করল, 'পদ্ম...আমি...আমি পদ্মজা।'

পদ্মজা চৈতন্য হারিয়ে হেলে পড়ে তুষারের ওপর। তুষার দ্রুত তাকে বাহুডোরে আটকে ফেলল। উঁচু কণ্ঠে ফাহিমাকে ডাকল, 'ফাহিমা, দ্রুত আসুন।'

১৯৮৯ সাল।

সকাল সকাল রশিদ ঘটকের আগমনে হেমলতা বিরক্ত হোন। তিনি বহুবার পইপই করে বলেছেন, 'পদ্মর বিয়ে আমি এখনি দেব না। পদ্মকে অনেক পড়াব।'

তবুও রশিদউদ্দিন প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন প্রস্তাব নিয়ে আসে। হেমলতার কথা হচ্ছে, মেয়ের বয়স আর কতই হলো? মাত্র ষোল। শামসুল আলমের মেয়ের বিয়ে হয়েছে চব্বিশ বছর বয়সে। পদ্মর বিয়েও তখনি হবে, ওর পছন্দমতো।

হেমলতা রশিদকে দেখেও না দেখার ভান ধরে মুরগির খোয়াড়ের দরজা খুলে দিলেন। রশিদ এক দলা থুথু উঠানে ফেলে হেমলতার উদ্দেশ্যে বলল, 'বুঝছ পদ্মর মা, এইবার যে পাত্র আনছি এক্কেরে খাঁটি হীরা।'

হেমলতা বিরক্ত ভরা কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'আমি কি আমার মেয়ের জন্য আপনার কাছে পাত্র চেয়েছি? তবুও বার বার কেন এসে বিরক্ত করেন?'

রশিদউদ্দিন হার মানার লোক নয়, সে হেমলতাকে বুঝানোর চেষ্টা করল, 'যুবতী মাইয়া ঘরে রাহন ভালা না। কখন কী হইয়া যাইব টের পাইবা না।'

'মেয়েটা তো আমার। আমাকেই বুঝতে দেন?' রশিদউদ্দিনের উপস্থিতি যে তিনি নিতে পারছেন না তা স্পষ্ট। তবুও রশিদ নির্লজ্জের মতো নানা কথায় তাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করল কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। ব্যর্থ থমথমে মুখ নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রতিদিন কোনো না কোনো পাত্রপক্ষ এসে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বলবে, 'মোর্শেদের বড় ছেড়িডারে চাই।'

সব পাত্র যদি এই এক মেয়েকেই চায় তাহলে তার কী করার? তাকেও তো টাকাপয়সা কামাতে হবে!

রশিদ গজগজ করতে করতে আওড়ায়, 'গেরামে কি আর ছেড়ি নাই? একটা ছেড়িরেই ক্যান সবার চোক্ষে পড়তে হইব?' কথা শেষ করেই সে এক দলা থুতু ফেলল সড়কে।

রোদ উঠতে না উঠতেই মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ, কিছুক্ষণের মধ্যে বৃষ্টি হবে। বছরের এই সময়ে এভাবেই রোদ-বৃষ্টির খেলা চলে। বর্ষায় একদম স্কুলে যেতে ইচ্ছে করে না পূর্ণার। শুধু মারের ভয়ে যেতে হয়। সে মুখ কালো করে স্কুলের জামা পরে পদ্মজাকে ডাকল, 'আপা? এই আপা? স্কুলে যাবা না? আপারে।'

বাড়িটি মোড়ল বাড়ি নামে পরিচিত। পদ্মজার দাদার নাম ছিল মিয়াফর মোড়ল। তিনি গ্রামের একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। চার পুত্রের জন্মের পর তাদের জন্য ছয় কাঠা জমির ওপর টিনের বিশাল বড় বাড়ি বানিয়েছিলেন। টগবগে দুই পুত্র ষোলো বছর আগে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নিহত হয়। ছোট ছেলে আট বছর বয়সে কলেরা রোগে মারা যায়। বাকি থাকে বড় ছেলে মোর্শেদ মোড়ল। বর্তমানে এই বাড়ির উত্তরাধিকার মোর্শেদ। যদিও তিনি সবসময় বাড়িতে থাকেন না, বাউন্ডুলে জীবন তার। স্ত্রী-সন্তানের অধীনেই এখন মোড়ল বাড়ি, তারাই বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ করে। পুরো বাড়ির চারপাশ জুড়ে গাছগাছালি। বাড়ির পিছনে টলটলে জলের স্রোতস্বিনী। অন্ধকার গাঢ় হতেই পরিবেশ নিশুতি রাতের রূপ ধারণ করে।

রাতের এই নির্জন প্রান্তর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাকে ছেয়ে গেছে। ঝিঁঝিঁ পোকার সঙ্গে পদ্মজার ভাঙা কান্না মিলেমিশে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মনে হচ্ছে কোনো আত্মা তার ইহজীবনের না পাওয়া কোনো বস্তুর শোকে এমন মরা সুর ধরেছে। হেমলতা পদ্মজাকে টেনে পাশে বসালেন। পদ্মজা ডান হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে হেমলতাকে বলতে শুরু করল, 'মামা সৌদিতে যাওয়ার আগের দিন ওই বাড়িতে খালামণি, ভাই, আফা সবাই এসেছিল। সেদিন ঢাকা থেকে যাত্রাপালার লোকও এসেছিল তাই...'

হেমলতা শিকারি পাখির মতো চেয়ে আছে। পদ্মজা কান্নার দমকে কথা বলতে পারছে না। হাত-পা কাঁপছে, তাকে ভীত দেখাচ্ছে। হেমলতা মেয়ের হাত চেপে ধরেন উৎসাহ দিতে ঠিক তখনই উঠোনে ধপ করে একটা আওয়াজ হয়। পদ্মজা কেঁপে উঠল। পূর্ণা, প্রেমা কথা শোনার জন্য দরজায়

কান পেতে রেখেছিল। হুট করে কিছু পতনের আওয়াজ হওয়াতে দুজন ভয় পেয়ে দরজা ঠেলে হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। হেমলতা গোপন বৈঠক ভেঙে দ্রুত পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ান। উঠানে বিদ্যুৎ নেই। পিছনে তিন মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। হেমলতা গলা উঁচিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন, 'কে? কে ওখানে?'

ভাঙা গলায় কেউ খুব কষ্টে উচ্চারণ করল , 'আমি।'

চির পরিচিত কণ্ঠটি চিনতে বিড়ম্বনা হলো না তার। তিনি দ্রুত পায়ে উঠানে ছুটে যান। গেইটের পাশে নিথরের মতো পড়ে আছে মোর্শেদ মোড়ল। তার গায়ে শীতের চাদর। হাঁপড়ের মতো উঠা-নামা করছে বুক। যেন দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। হেমলতা চোখেমুখে ছড়িয়ে পড়ে উদ্বেগ। তিনি দুই হাতে মোর্শেদকে আঁকড়ে ধরেন। পদ্মজা, পূর্ণা, দৌড়ে এলো সাহায্য করতে। মোর্শেদের এমফাইসিমা রোগ আছে। এই রোগে অল্প চলাফেরাতেই শ্বাসটানের উপক্রম হয় এবং দম ফুরিয়ে যায়। শ্বাস নেবার সময় গলার শিরা ভরে যায়। তিন মা-মেয়ে মোর্শেদকে ধরে ঘরে নিয়ে যায়।

মোর্শেদ হুট করে বাড়ি ছাড়ে, হুট করেই বাড়ি ফেরে। কখনো কাকডাকা ভোরে, কখনো নিশুতি রাতে, কখনো কাঠফাটা রোদে তার মনে পড়ে নিজ আলয়ের কথা; ফিরে আসে ক্ষিপ্ত ঘোড়ার মতো।

মোর্শেদের এমফাইসিমা রোগটা ধরা পড়ে সাত বছর আগে। তার অ্যাজমা ছিল আবার ধূমপানেও আসক্ত। ফলে ফুসফুসের এই রোগটি খুব দ্রুত আক্রমণ করে বসে।

মোর্শেদ খানিকটা সুস্থ হয়ে রাত একটার দিকে ঘুমিয়ে পড়েন। পূর্ণা, প্রেমা ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। পদ্মজা বারান্দার ঘরে ঝিম মেরে বসে আছে। তার চোখের দৃষ্টি জানালার বাইরে। জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে! কি সুন্দর দৃশ্য! সেই দৃশ্যের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে থেকে পদ্মজা ভাবছে, আম্মা এখনো আসছে না কেন?

সে আজ সব বলতে চায়, হৃদয়ের ক্ষত বয়ে বেড়ানো যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে দরজার পাশে এসে দাঁড়ান হেমলতা। হাতে থাকা হারিকেনের তীব্র আলোয় পদ্মজা গুটিয়ে যায়।

হেমলতা হারিকেনের আগুন নিভিয়ে পদ্মজার পাশে গিয়ে বসেন। পদ্মজা সবকিছু বলার জন্য তৈরি ছিল তবুও অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে।